শিক্ষা সমাজ দেশ

বিকারগ্রস্ত রাজনীতির কবলে মানুষ-সমাজ-দেশ

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম 'বিকারগ্রস্ত রাজনীতির অবসান হোক')

– ড. হাসনান আহমেদ

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে এত গান মনে হচ্ছে, সংকেতটা ভালো নয়। ইচ্ছে ছিল আল্লা-বিল্লে করে মরবো। দেশের অবস্থা দেখে তা করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না, ঈমান-আমান নষ্ট করে দিচ্ছে। সমাজ ও মানুষ, যাকে আমরা জনসম্পদ বলি, ইতোমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা অপূরণীয় ক্ষতি। সেই ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু, বাংলাদেশিরা মুক্তি পেল কই? মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করা যত সহজ, গড়তে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো লাগে, সময়সাপেক্ষ ব্যাপার–এ কথা আমরা সবাই বুঝি। তাও সার্থকতা নিয়ে সন্দেহ মন থেকে যায় না। লালন গেয়েছিলেন, 'পাবে সামান্যে কি তার দেখা, বেদে নাই যার রূপরেখা, ও রে বেদে নাই যার রূপ রেখা-আ-আ...'। পতিত সরকার দেশের প্রতিটা বিভাগ, সমাজ, মানুষের স্বভাব পুরোপুরি পচিয়ে নষ্ট করে, ধ্বংস করে, লুটেপুটে নিয়ে নিজেরা হাঁড়ি চেটেপুটে খেয়ে পালিয়েছে। শেখ মুজিব বলতেন 'চাটার দল'। আমি নাম দিয়েছি 'হাঁড়ি-চাটার দল'। এখন যত বোঝা অন্তর্বর্তী সরকারের ঘাড়ে। 'ঘাটের মরা ফেলবি তো ফেল, না ফেললে গন্ধে মর'।

এর পরও একটা শ্রেণি পতিত সরকারের পক্ষে শ্লোগান হাঁকছে, তারা আবার এদেশে তথাকথিত রাজনীতি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তাদের জিজ্ঞেস করতে মনে চায়, 'আচ্ছা বলো তো, তোমাদের আক্কেলটা কী? পার্শ্ববর্তী দেশে বসে কেউ কেউ কলকাঠি নাড়ছে আর তোমরা মওকা বুঝে সাড়া দিচ্ছ, তোমাদের আত্মজিজ্ঞাসা বলতে কি কিছু আছে? দেশপ্রেম? নাকি লবডঙ্কা? তোমরা তো স্বাধীনতা যুদ্ধে খানসেনাদের অনুগত এ দেশীয় দোসরদেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছ, মনে একবার ভেবে দেখ তো! তোমরা কি পার্শ্ববর্তী দেশের খাস দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছো না?' আমরা এখন উভয় সংকটে পড়ে আছি; 'মারলে মরে যায়, ছেড়ে দিলে কামড়ে দেয়' অবস্থা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের বড় কারণ ছিল, পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকরা নানা কৌশলে এদেশকে শোষণ করছিল। যুদ্ধ শুরু হলে এ দেশীয় দোসর তাদের সহযোগিতা করেছিল। সেটা যদি আমরা মেনে নিতে না পারি, এদেশীয় দোসর ও 'মীরজাফরদের' প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের শোষণ করে আসছে, গোপনে গোয়েন্দা-রসদ দিয়ে দোসরদের জোর করে যুগ যুগ ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল, গণহত্যা চালিয়েছে, আজ্ঞাবাহী দোসর ও গোয়েন্দা দিয়ে দেশ চালিয়েছে, দোসর অবাধে দেশ লুট করেছে; দেশপ্রেমী বাংলাদেশী তা মেনে নেবে কীভাবে? যতদূর মনে পড়ে, মাওলানা ভাসানী তার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'দেশটা সাদা ভল্লুকের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে কালো ভল্লুকের খপ্পরে পড়েছে'। তাই যদি হয়, আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব কোথায়? আমরা তো সম্প্রসারণবাদী ভারতের কাছে জিম্মি হতে পারি না। অনেকে বলেন, আমাদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে '৭১ সাল থেকে। আমার দৃষ্টিতে আন্দোলন শুরু হয়েছে ব্রিটিশ শাসক এদেশ দখলে নেওয়ার পর থেকে। ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাস আমাদের জানতে হলে অনেকের লেখা ইতিহাস আমাদের পড়তে হবে সেই বৈদিক যুগ থেকে। জানা যাবে কার ভূমিকা কি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের রসদ ও অর্থের সংস্থান গোপনে করেছিল 'জগৎশেঠ' নামের এক ভারতীয় ব্যবসায়ী। তার আসল নাম 'ফতেহ চাঁদ', পিতা 'মানিক চাঁদ', দাদা হিরেন্দু সাহু।

ব্রিটিশ এদেশ শাসন করার সময় সে-দেশ থেকে লোক আনতো পাঁচ-দশ হাজার। এদেশ থেকেই ব্রিটিশদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য ভাড়াটে-ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ-তাবেদার তৈরি হতো পঞ্চাশ হাজার। এজন্য তাদের কিছু টাকা খরচ করতে হতো। আমাদের দেশপ্রেমের অভাবের সুযোগ তারা নিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সে পথই ধরেছে। নিজেদের লোক এদেশে ভিড়িয়েছে লাখে লাখ– কেউ চাকরিতে, কেউ গোপন বাহিনীতে; এদেশে সুবিধা ও টাকা দিয়ে অনুগত দালাল ও দখলদার ভাড়া নিয়েছে আরো লাখে লাখ। তাদের নেত্রী বর্তমানে লুটতরাজ করে

ছাত্র-জনতার বিপ্লবে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে প্রভুর পদতলে হাজির হয়েছে, একটা গতির অন্বেষণে। প্রভু হয়তো নিজের কাছে সেবাদাসী হিসেবে আশ্রয় দেবে, নইলে অন্য কোনো বন্ধুদেশে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। প্রভু তার একনিষ্ঠ ভক্তকে কোনোদিন ভুলবে না, মুখে যত মধুমাখা কথাই বলুক। এটা আমাদের সবার জানা প্রয়োজন। বিগত পাঁচটি নির্বাচনে প্রভুকে নিয়ে অনেকে অনেক বড় বড় কথা বলেছে। আমি অন্তর থেকে জানি, প্রভু কখনো ভক্তদেরকে রিক্ত হাতে ফেরাবে না। যথাসাধ্য করেছেও। প্রভুর দরকার নিখাদ ভক্তের, স্বার্থ আদায়ের। তা তারা স্বাধীনতার আগ থেকেই চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং ঠিকমতো পেয়েও গিয়েছিল। আমরা বুঝিনি।

এদেশের মানুষের যে জনসমর্থন, একতা ও মনোবল ছিল, কষ্ট একটু বেশি হলেও এরা নিজের চেষ্টায়ই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারত, হয়তো সময় একটু বেশি লাগত। প্রভু বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে সে-সুযোগটা কাজে লাগিয়েছিল। এ কথা আমি গত সপ্তাহের লেখাতেও লিখেছি। পতিত ভিনদেশি-তাবেদার সরকার এদেশে যে শেষখেলার চমক দেখিয়ে গেল, কোনো দেশপ্রেমী মানুষ তা কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না, কোনোদিন ভুলবেও না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পশ্চিম-পাকিস্তানি হানাদার শাসককেও হার মানিয়েছে। ভারতের হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার শেখ হাসিনার পরাজয়কে নিজেদের পরাজয় হিসেবে দেখছে, যেমন স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয়কে ভারত আজও তাদের কাছে পশ্চিম-পাকিস্তানের পরাজয় বলে প্রকাশ্যে প্রচার করে। ভারত ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমাদের নিয়ে বিশ্বের কাছে ইসলাম-ফোবিয়ার ধুয়ো তুলছে এবং সংখ্যালঘু কার্ড ব্যবহার করছে। নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, আমরা আসলেই 'জঙ্গী' কীনা? মূলত মঞ্চস্থ নাটক, বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই; তবুও তারা বলে চলেছে। বিশ্বব্যবস্থাকে বর্তমানে জিও-পলিটিক্যাল ভারসাম্যহীনতা হিসেবে দেখলেও আমার চোখে পুরো ব্যবস্থাকেই থিও-পলিটিক্যাল কনফ্লিক্ট বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ইজরাইলের সাথে ভারতের ঠিকই দহরম-মহরম। ফলে এ অবস্থায় আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজেদের একত্র হতে হবে, জোট বাঁধতে হবে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের প্রচেষ্টায় শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। আওয়ামিলীগ সহ ১৪ দল তা বুঝবে না, আমাদের এ সমীকরণ বুঝতেই হবে। আমরা তো মুসলমানিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অন্য কোনো ধর্মে যোগ দিতে পারবো না; আবার ধর্মবিদ্বেষীও হতে পারবো না। তবে যে যত যা-ই বলুক, আমাদের ধর্ম-অহিংস হতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী হতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে বুঝতে হবে, সব 'হাঁড়ি-চাটার দল' এদেশ থেকে পালিয়ে যায়নি। তারা এখনো বহাল-তবিয়তে অক্ষত আছে। তারা বিভিন্ন দলের মধ্যেও ঢুকে আছে। তাদের মানসিকতাও বদল করেনি। বিগত ষোলো বছর ধরে প্রতিটা সেক্টরে-বিভাগে, প্রশাসনের পরতে পরতে দলীয় লোকজন বেছে বেছে পদে বসানো হয়েছে। রসদের বোতল উপুড় করে তাদের মুখে ধরে রাখা হয়েছে। যত পারো চেটে চেটে খাও আর গুণগান গাও। তাই হঠাৎ করে ভালো লোক পাওয়া কঠিন। এখন যাকেই কোনো পদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হবে। যাকেই যে পদে বসাবেন, দোষ হবে আগের দল থেকেই সিলেকশন দেওয়া হয়েছে। অথচ বিকল্প পাওয়া দুষ্কর। যারা পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত বলে দাবী করবে, তারা সবাই যে পতিত সরকারের কারণে পদবঞ্চিত, তাও নয়। সাদামাটা বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না, এ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। কাজটা এত সহজ নয়। এর মধ্যে একটা দালাল শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে বা হবে, যারা অন্তর্বর্তী সরকারের নাম বিক্রি করে টাকা কামাতে সচেষ্ট থাকবে। অতীতের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে। আবার অসংখ্য সমন্বয়কদের সবাই যে শততার সাথে কাজ করবে, এমনটিও নাও হতে পারে। সব দোষ গিয়ে পড়বে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর। 'যা কিছু হারাক, কেষ্ট বেটাই চোর' বলে প্রতীয়মান হবে। এসব ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া উপদেষ্টামণ্ডলীকে একজোট হয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা বেশি প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। সময় লাগলেও এই বিকারগ্রস্ত রাজনীতি থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির জীবনে দেশ সংস্কার ও গড়ার সুযোগ দেখে মরার সৌভাগ্য আর

হবে না। অনেক রাজনীতিবিদও আছেন, যাদের বয়স হয়েছে। যদি দেশকে কল্যাণ-রাষ্ট্র বানাতে চান নিজের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে ত্যাগ করুন, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করুন। অন্য কিছু না হোক, অন্তত আঠারো কোটি মানুষের মুক্তির সওয়াবের ভাগিদার হবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রত্যেক সদস্যকে সে মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। কোনো ব্যক্তিগত ইজমকে পরিহার করতে হবে। সবকিছু আর কিছুদিন পরেই জনসাধারণের চোখে ধরা পড়বে।

আমি গ্রামের মানুষ। প্রচণ্ড খরায় কখনো ধানের জমি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। ধানগাছ মরমর অবস্থায় পৌঁছে যায়। ক্ষেতে পরিমিত পানির দরকার হয়। সে সময় পরিমিত পানির পরিবর্তে বন্যার ঢেউ-খেলানো পানির তোড় হঠাৎ ক্ষেতে প্রবেশ করলে ধানগাছগুলোর মরণের কারণ হয়ে দাঁড়াই। বেশি পানিতে চারাগাছ পচে যায়। সরকার বেশি উদার গণতন্ত্র হঠাৎ দেশে চালু করে দিলে বিষয়টা তেমনই দাঁড়াবে। জনগোষ্ঠীকে আগে গণতন্ত্রে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, সুশিক্ষিত করতে হবে। গণতন্ত্রের দড়ি আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। গণতন্ত্রের বদৌলতে কোনো অপশক্তি দেশের ঘাড়ে চেপে বসলেই আবার বিপদ। হঠাৎ অতি ভালো ভালো নয়। শরীরের যে অংশটা পচে নষ্ট হয়ে গেছে, পরীক্ষাতেও তা ধরা পড়লে সেটাকে কেটে অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলাই যৌক্তিক। যার গায়ের গন্ধে ঘুম হয় না, তার নাম আতর আলী বলে ডাকার কোনো মানে হয় না। চর দখলের মতো দেশ দখল করে লুটপাট ও দেশবিক্রি যাদের স্বভাব, তাদের অস্তিত্বকে রাজনৈতিক দল নাম না দিয়ে দুর্বৃত্ত-গোষ্ঠী বলাই সমীচীন। এরা রাজনৈতিক দল নামের কলঙ্ক, তা সে যে দলই হোক না কেন। যে কোনো অন্যায় ও অপরাধকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এখানে উদারতা দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। পতিত রাজনৈতিক দল জাত ক্রিমিন্যাল প্রমাণিত; তবে অন্য সব দলই যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও নয়। বিষ্ঠার উভয় পিঠই দুর্গন্ধ। রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকে এ বিষয়গুলো নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করা যেতে পারে। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান দেখতে পাচ্ছি না। এতে ভবিষ্যৎ পরিবেশ সংশয়াকুল থেকে যাচ্ছে, তা যে দল যত উঁচু গলায় কথা বলুক না কেন।

আইন ও সংবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে সংস্কারই সবকিছু নয়; সঠিক বাস্তবায়ন এদেশে বড় সমস্যা। আংশিক বাস্তবায়ন সংস্কার না করার শামিল। বাস্তবায়ন করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি কর্মকর্তারা। আমার দেখা চোখে, কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বল উজাড় হবে বলে আমার বিশ্বাস। 'সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা'র প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপক দুর্নীতি ঢুকে গেছে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই; সরকার-দলীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী হয়ে গেছে। বেশ কিছু এমপিওভুক্ত স্কুল শিক্ষক আমার কাছে অনেকদিন ধরে ফোন করে বলছেন যে, তাদের অবসর সুবিধা পেতে ইচ্ছাকৃতভাবে যারপরনাই দেরি করা হচ্ছে, অনেক টাকা দাবি করা হচ্ছে। নইলে বিভিন্ন ছুতাই ফাইল ফেলে রাখা হয়। এদের দেখার কেউ নেই। সংশ্লিষ্ট মহল তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করলে অসহায় কিছু শিক্ষক শেষ বয়সে এসে বড়ই উপকৃত হন। আবার সেই লালনের গান গাইতে হচ্ছে, 'সময় গেলে সাধন হবে না, দিন থাকতে দ্বীনের সাধন কেন জানলে না, সময় গেলে...'।

(১০ অক্টোবর ২০২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ